তখন ও এখন

গীতা দাস

(৩)

ছোটবেলায় বর্ষায় নদীতে ইচ্ছে মত ডুবাতাম। তুমুল বৃষ্টিতে নদীর জল কী ওম ওমই না লাগত। চোখ লাল না হওয়া পর্যন্ত উঠতাম না। লাল চোখ সাদা করার জন্য দুই হাতে নিজেদের চোখ ঢেকে দল বেঁধে ছড়া কাটতাম ---

'কাউয়া রে কুলিরে
আমার চোখ নিয়া
তোর চোখ দে'।

অনেক ক্ষণ দুই হাতে নিজেদের চোখ ঢেকে রাখার পর চোখ সাদা হত কি না এখন আর মনে নেই। বা সাদা হলেও এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কি না তা আমার জানা নেই।

লাল চোখ মানেই বাড়িতে ধরা পড়ার ভয়। অনেকক্ষণ ডুবিয়েছি বলে জ্বর আসার আশংকায় সোনা কাকার শাস্তি দেয়া। শাস্তি ছিল কান ধরে পঞ্চাশ বা একশ'বার উঠ বস করা অথবা এক পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পঞ্চাশ বা একশ' পর্যন্ত গণনা করা।

ডুবাডুবি। হৈ হুল্লুড়। চিৎ সাঁতার। ডুব সাঁতার। ভেসে থাকা। পদ্মাসন হয়ে ভেসে থাকা। সুঁই সুঁই খেলা। একজনকে আরেক জনের ছোঁয়াছোঁয়ি। এর মধ্যে প্রতিযোগিতাও ছিল। পাল্লা দিয়ে নদী পাড়ি দেয়া। এখন চার দেয়ালের ভেতর সাওয়ার ছেড়ে স্নান করি। আর শীতকালে করি গিজারে বা চুলায় জল গরম করে।

মা কাকিমারা শীত গ্রীস্ম বারমাস সকালে ঠান্ডা জলেই স্নান করতেন।

বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে চকে খেলতে যেতাম। চক মানে ফসল তোলার পর পতিত জমি। ছেলেরমেয়েরা একসাথেই খেলতাম। জেন্ডার বিভাজন বুঝিনি। দাড়িয়াবান্দা,কানামাছি, গোল্লাছুট, সাতচারা। সন্ধ্যায়

হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসা। বেশি ধূলা ভরলে বা গরম পড়লে গা ধূয়ে ফেলা। আজকের শহুরে বাচ্চারা সেই সমৃদ্ধ শৈশব পাবে কোথায়! এখন দরজা আঁটা বিকেল। কম্পিউটার গেমে মত্ত চোখ ও হাত। টিভি পর্দায় মগ্ন চোখ ও মন। অবশ্য উপায় কী?

ছোটবেলায় আরেকটি খেলা ছিল মাটির ঢেলা নদীর জলের উপর দিয়ে কে কত বেশি বার জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঢিল ছুঁড়তে পারে এর প্রতিযোগিতা। ঢিলটি জলের উপর যেত ব্যাঙের লাফের মত।

আম বা বরই গাছের কোন আম বা বরই কে কত কম ঢিলে পাড়তে পাড়বে এ প্রতিযোগিতাও চলত। গাছটি যদি হত কোন মুখরা বুড়ো রমণীর তবে তা চুপিসারে করার চর্চা চলত। মাঝে মাঝে কাঙ্খিত আম বা বরই মাটিতে পড়লেও কুড়িয়ে আনতে পাড়তাম না। এর আগেই মুখরা বুড়ো রমণী এসে হাজির। আর আমরা ছুট। তবে ঐ বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা আসলে ধাক্কাধুক্কি দিয়ে কাঙ্খিত আম বা বরই নিয়েই আসতাম। টক আম বা বরই খাওয়ার জন্য লবণ ও মরিচের গুড়া মিশিয়ে নিয়ে যেতাম।

আর এখন! বেছে বেছে আম কিনে আনি। ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে কেটে প্লেটে সাজিয়ে কাটা সমেত ছেলেমেয়ের সামনে ধরতে হয়। টক বরই মুখেই নেয় না। আমরা তো কাঁচা টক বরই, আধা পাকা, আধা শুকনা, বরই চটকে ধনে পাতা দিয়েখেতাম। আধা শুকনা, শুকনার আলাদা আলাদা স্বাদ আস্বাদন করতাম।

ঝিনুক ঘষে মাঝখানে ফুটা করে এ দিয়ে কাঁচা আমের খোসা ছাড়াতাম। ছেলেদের অনেকে চাকু রাখত। আম কাটার সরঞ্জাম ব্যবহারেও ছিল লিঙ্গগত পার্থক্য। যার কাঁচমিঠা আম গাছ ছিল তার তো আমের দিনে ঘুম হারাম। ঐ গাছের আম চুরির হিড়িক থাকত সর্বাধিক। আমের ফলসি, আম সত্ব, কাঁচা আম সরিষা বাটা দিয়ে বা দুধ দিয়ে মাখিয়ে খাওয়া। দাঁত এত টক হত যে অন্য কিছু আর খাওয়াই যেত না।

আমের বরা বা আঁটি একটু অঙ্কুরোদগম হলে তা দিয়ে বাঁশি বানাতাম। উপরের শক্ত ছালটুকু ফেলে দিয়ে আগার অংশ আম গাছে ঘষে একটু ফাঁকা করে বাঁশি বাজাতাম। যদি ঘষতে গিয়ে দু ভাগ হয়ে যেত তবে মাঝে একটা পাতা দিয়ে বাজাতাম। কলার ডাগ্যা আধ হাত লম্বা করে টুকরো করতাম। সে সব টুকরো আবার এক বিঘা পরিমাণ লম্বায় দু' দিক থেকে কেটে তিনটি পরত করে দু'পাশের দু'টি পরত একটু ভেঙ্গে বাজাতাম। এসব প্রাকৃতিক উপাদান ছিল খেলার সামগ্রী --- বিনোদনের মাধ্যম ।

শুধু মৌসুমী মেলা থেকে বাঁশি, লাটিম,ডুগডুগি বা ঠনঠনি কিনতাম। এখন! ইলেকট্রনিক খেলনার বাহার। কম্পিউটার গেম। প্রাকৃতিক সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত প্রজন্ম।

ঢাকায় বৈশাখী মেলা বা বিজয় মেলায় শুধু নয় --- এখনো আমি সুযোগ পেলেই গ্রামে-গঞ্জে লোকমেলায় যাই। মাটির হাঁড়ি-বাসন, বাঁশের সরঞ্জামাদি, বাঁশি, লাটিম,ডুগডুগি বা ঠনঠনি কিনি। সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়- স্বজনদের বাচ্চাদের উপহার দেই।

রান্না বাড়া খেলাও খেলতাম। কচুরি দিয়ে নানা রকম পদ বানাতাম। ফোলা কচুরি, লম্বা কচুরি, কচুরির বেগুনি রঙের ফুল সংগ্রহ করে আনতাম। কচুরি ফুলের ভরা ভাজতাম। ফোলা ও লম্বা কচুরি বিভিন্ন নকশায় কেটে ইটের গুড়া মিশিয়ে রান্না হত। আরও আনতাম বিভিন্ন রকমের গাছ গাছালির ফুল ও পাতা। এক ধরনের আগাছার ফুল দিয়ে ফুল কপি বানাতাম। আরেক ধরনের নরম পাতা হাতে টিপে লুচি বানাতাম। তালের দিনে তাল ছিলে যে জলে ভিজানো হত সে উচ্ছিষ্ট জলে চুন মিশিয়ে দই পাততাম। আম গাছের ছালের সাথে চুন মিশিয়ে হলুদ রঙের টক রাঁধতাম। মিছেমিছি খেয়ে কারটা বেশি সুস্বাদু হয়েছে তা নিয়ে সত্যিকারের ঝগড়াও হত।

ছোটবেলায় আমার আইসক্রীমওয়ালা বা মুদির দোকানদার হবার বড় শখ ছিল। শ্রম বিভাজনের তাত্বিকদিক না বুঝলেও তখনই

অপ্রথাগত পেশার প্রতি ঝোঁক ছিল। তাই রান্না বাড়া খেলার সময় আয় করতে মাঝে মাঝে পেশা হিসেবে আইসক্রীমওয়ালা বা মুদির দোকানদার হতাম। যদিও আশেপাশের কোন মহিলাকে আইসক্রীমওয়ালা বা মুদির দোকানদার হতে দেখিনি। গ্রামে ঘরের ভিতরেই যাদের মুদির দোকানের মাল মসলা বেচার ব্যবস্থা ছিল শুধুমাত্র সে সব বাড়িতে পুরুষরা বাড়ি না থাকলে মহিলারা মেপে দিতেন।

কলা গাছের খোল দিয়ে বিশেষ কায়দায় ভাঁজ করে শলা গেঁথে আইসক্রীম বাক্স বানাতাম। আবার কলা গাছের খোল আইসক্রীমের সাইজে কেটে বা কচুরিতে নারকেলের শলা বা বাঁশের কাঠি ঢুকিয়ে আইসক্রীম বানাতাম। অথবা নিজেদের খাওয়া আইসক্রীমের কাঠি জমিয়েও রাখতাম। মুদির দোকানদারিতে নারকেলের মালা দিয়ে দাঁড়িপাল্লা বানাতাম। মাটির হাঁড়ি পাতিল ভাঙা চাড়া দিয়ে বিনিময় মূল্য ধরা হত। চাড়া গোল বা লম্বা এসব নকশার উপর মান নির্ভর করত।

এখন মনোপুলি খেলে খেলে শিশুরা ব্যবসা শিখে, লোগো দিয়ে --- ব্লক দিয়ে বিল্ডিং বানায় , গাড়ি বানায়। খেলনা পিস্তল দিয়ে হাইজ্যাকার হাইজ্যাকার খেলে।

পুতুলের বিয়ে দিতাম। বিয়ে উপলক্ষ্যে খাওয়ানো হত বাদাম বা আইসক্রীম জাতীয় কিছু। নারকেল পাতা দিয়ে ঘড়ি আংটি বানিয়ে যৌতুক দিতাম। দর্জির দোকান থেকে সংগ্রহ করে আনা সবচেয়ে ভাল কাপড়ের টুকরোটি দিয়ে জামা বানিয়ে যৌতুক দিতে হত।

এ সব আচরণ সামাজিকীকরনের ফসল বৈ তো নয়।

গীতা দাস
ঢাকা
১১চৈত্র,১৪১৪/২৫মার্চ,২০০৮

grdas2006@yahoo.com